অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 126-133
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.017

MOTI NANDIR KATHASAHITYE NAGAR-PORIBESHBAD BHABNA : 'CHATURTHA SIMANA' GALPER BISHES PATH / মতি নন্দীর কথাসাহিত্যে নগর-পরিবেশবাদ ভাবনা: ‘চতুর্থ সীমানা’ গল্পের বিশেষ পাঠ

RIYA GHOSH / রিয়া ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস)
Email: riariaghosh03@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords: আরবান ইকোক্রিটিসিজম, চতুর্থ সীমানা, মানবিক বিচ্ছিন্নতা, নগরায়ন, অবক্ষয়, মনস্তত্ত্ব।

Abstract:

বিশ শতকের উত্তর-উপনিবেশবাদী বাংলা কথাসাহিত্যে মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০) মূলত কলকাতার নাগরিক জীবনের এক নির্মোহ ও ক্ষুরধার ভাষ্যকার। প্রথাবদ্ধ পরিবেশবাদী সমালোচনা বা ‘ইকোক্রিটিসিজম’ প্রধানত নদী, পাহাড়, অরণ্য অথবা আদিম প্রকৃতি নিয়ে মগ্ন থাকে। ‘আরবান ইকোক্রিটিসিজম’ বা ‘নগর-পরিবেশবাদ’ উন্মোচন করে মানুষের তৈরি কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্র, অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন, তীব্র স্থানসংকট, এবং পুঁজিবাদের আগ্রাসনে প্রাকৃতিক ভূখণ্ডের রূপান্তর , এবং তার থেকে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক ও সমাজ রাজনৈতিক দুরবস্থাকে। এই আলোচনায় আমরা মতি নন্দীর ছোটগল্প ‘চতুর্থ সীমানা’-কে ভিত্তি করে তাঁর কথাসাহিত্যে নগর-পরিবেশবাদী ভাবনার বিশ্লেষণ করব। আমাদের আলোচনার প্রথমাংশে, বিশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে লবণহ্রদ (Saltlake) ও পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (East Kolkata Wetlands) ভরাটের যে বাস্তব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ট্রাজেডি শুরু হয়েছিল, তার সাথে গল্পের পটভূমিকে মেলানো হয়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের ‘পরিবেশগত আত্মহত্যা’র তত্ত্ব এবং রামচন্দ্র গুহর ‘পরিবেশ-ইতিহাসের’ সূত্র ধরে দেখানো হয়েছে কিভাবে আবাসন শিল্পের স্বার্থে কলকাতার জলাভূমিগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিখিল ও রুবির ‘তিন কাঠা’ জমির আকাঙ্ক্ষা আসলে প্রকৃতির বুকে নগরের সেই প্রথম হিংস্র কামড়ের সামাজিক প্রতিফলন।

আলোচনার দ্বিতীয়াংশে, মারি বুকচিনের ‘সমাজ পরিবেশবিদ্যা’ (Social Ecology) তত্ত্বের আলোকে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বিক রূপান্তর এবং মধ্যবিত্তের স্থানিক উৎকণ্ঠা(Spatial Anxiety), পরিবেশগত বৈষম্য (Ecological Injustice) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিখিল-রুবির ‘তিন কাঠা জমি’র মালিকানা ও শহুরে আভিজাত্য নিশ্চিত করার তাগিদে নিজস্ব বাসস্থানের সীমানা নির্ধারণ এবং শেষ পর্যন্ত ছোটকাকির অসুস্থতার চিকিৎসার খরচের জন্য নিখিলের নিজের বাড়ি তৈরীর স্বপ্নকে বিসর্জন, এখানে গভীর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। নিখিলের অবচেতন মনে জমির স্তম্ভ গুলির প্রতীকী রূপান্তর এবং ট্রাজিক বাস্তবতার সামনে মধ্যবিত্তের নির্মিত পরিবেশে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়া গল্পটিকে এক ভিন্ন সামাজিক মাত্রা দিয়েছে।

‘চতুর্থ সীমানা’ কেবল এক মধ্যবিত্ত দম্পতির জমি কেনা বা বাড়ি বানানোর গল্প নয়। এখানে দেখা যায়, জমির আইনি ‘দলিল-পর্চা’র চারদিকের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষ তার চারপাশের মানবিকতা ও সহমর্মিতার আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। গল্পটি আসলে আত্ম হননকারী নাগরিক সভ্যতার এক দূরদর্শী ও পরিবেশ-রাজনৈতিক (Eco Political) আখ্যান। একবিংশ শতাব্দীর জলবায়ু ও পরিবেশ সংকটের আবহে দাঁড়িয়ে মতি নন্দীর এই নগর-পরিবেশচেতনা পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী ও প্রাসঙ্গিক।

Discussion:

বিশ শতকের শেষভাগে বিশ্বজুড়ে পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনায় এক অভূতপূর্ব তাত্ত্বিক রূপান্তর দেখা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যতত্ত্বে যা ‘Urban Ecocriticism’ বা ‘নগর-পরিবেশবাদ’ নামে পরিচিত। শেরিল গ্লটফেল্টি, উইলিয়াম হাউয়ার্থের মত প্রথম সারির পরিবেশবাদী সমালোচকেরা যখন বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে ইকোক্রিটিসিজমের প্রাথমিক পরিকাঠামো নির্মাণ করেছিলেন, তখন তাদের মনোযোগের সম্পূর্ণ কেন্দ্রে অবস্থান করছিল গ্রামীণ ল্যান্ডস্কেপ। তার মধ্যে ছিল মানুষের স্পর্শহীন কুমারী প্রকৃতি, আদিম অরণ্য, নদীকেন্দ্রিক জীবন। এই প্রথাগত চিন্তার একমুখী সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে পরবর্তীকালে মাইকেল বেনেট ও ডেভিড ডব্লিউ টিগ প্রভৃতি তাত্ত্বিকরা পরিবেশবাদকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করেন। তাঁরা দেখান যে, উত্তর উপনিবেশবাদী বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দৈনন্দিন জীবন আসলে অতিবাহিত হয় এক সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও মানবনির্মিত বাস্তুতন্ত্রের সংঘাতময় পরিমণ্ডলের ভেতর। ফলে শহরের পিচঢালা রাস্তা, বহুতল আবাসন, কারখানার কালো ধোঁয়া, মাটির তলায় আবদ্ধ ড্রেন, ঘিঞ্জি গলি এবং জলের কলের লাইনও একটা নতুন পরিবেশের জন্ম দেয়। যাকে সমকালীন তাত্ত্বিকরা বলেন ‘Built Environment’ বা ‘নির্মিত পরিবেশ’। এই নির্মিত পরিবেশ কোন নিষ্ক্রিয় উপাদান নয়, বরং মানুষের সামাজিক চেতনা ও মনস্তত্ত্বকে প্রতিনিয়ত এটি নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্গঠন করে চলেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতি’ বা ‘আরণ্যক’-এ দেখা যায় নিবিড় অরণ্যঘেঁষা ও আধ্যাত্মিক রোমান্টিক প্রকৃতিচেতনা। সেই চেতনা, স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে এসে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু জনসংখ্যার বিপুল চাপ, চোরাগোপ্তা পুঁজিপতিদের আধিপত্যে গড়ে ওঠা নগরায়ন, শহরের জলনিকাশি নীচুজমি বোজানোর একচেটিয়া হিড়িক এক রূঢ় ও শ্বাসরোধকারী নগর-বাস্তবতার জন্ম দিয়েছিল। বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এই কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে নির্মোহ, বাস্তববাদী এবং তীক্ষ্ণ রূপকার

হলেন মতি নন্দী। তিনি উত্তর কলকাতার কানাগলি, মধ্যবিত্তের অবরুদ্ধ ফ্ল্যাটবাড়ি, ধুলো-ধোঁয়ায় ধূসর খেলার মাঠ এবং শহরতলীর নতুন উপনগরী ও কলোনি গড়ে ওঠার পটভূমিতে মানুষের বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর লড়াই এঁকেছেন। যা আরবান ইকোক্রিটিসিজমের এক অসামান্য উদাহরণ। বিশেষ করে তাঁর ‘চতুর্থ সীমানা’ছোটগল্পটি কলকাতার প্রান্তে গড়ে ওঠা এক নতুন ‘প্লট সংস্কৃতির’ অবয়ব ফুটিয়ে তোলে। যা একাধারে প্রকৃতির ভৌগলিক রূপান্তর এবং মানুষের মানবিক অবক্ষয়ের এক পরিবেশ-রাজনৈতিক (Eco Political) পাঠ। মতি নন্দীর ‘চতুর্থ সীমানা’-র পরিবেশগত বিন্যাস এবং চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ বুঝতে হলে প্রথমে এর সাথে জড়িয়ে থাকা কলকাতার বুকে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের বাস্তব এবং ঐতিহাসিক সত্য অনুধাবন করতে হবে। বিশ শতকের ছয় ও সাত এর দশকে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ জলাভূমি অঞ্চল, যা ‘East Calcultta Westland’ নামে পরিচিত, সেখানে ব্যাপক আকারে মাটি-ভরাট ও আবাসন নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ঐতিহাসিকভাবেই বিশাল জলাভূমি অঞ্চলটি ছিল কলকাতার এক অনন্য ‘প্রাকৃতিক স্পঞ্জ’। এটি শহরের অতিরিক্ত জল ও বর্জ্য শোষণ করে সম্পূর্ণ কম খরচের প্রাকৃতিক সংশোধন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং পূর্ব কলকাতার জলাভূমি আন্দোলনের পুরোধা ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ এই অঞ্চলের বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন-

> “The East Calcutta Westlands are unique example of low cost environmental cleanup...To destroy them for real estate is not development, it is ecological suicide” [১]

কিন্তু মধ্যবিত্তের তীব্র আবাসন সংকট এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসার মুনাফা লোভী আগ্রাসন এই পরিবেশগত আত্মহত্যাকে একধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈধতা দিয়েছিল। ‘চতুর্থ সীমানা’ গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি কেন্দ্রীয় চরিত্র নিখিল ও তার স্ত্রী রুবি বাসে করে কলকাতার উপকণ্ঠে সদ্য গড়ে ওঠা এক নতুন কলোনি বা প্লটের এলাকায় আসছে। সেখানে নিখিল তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে ‘তিন কাঠা’ জমি কিনেছে। কলোনিতে ঢোকার মুখে রুবির চোখে যে দৃশ্য ধরা পড়ে তা কোন রোমান্টিক প্রকৃতির রূপ নয়, সে এক ক্ষয়িষ্ণু এবং লুণ্ঠিত প্রকৃতির বিবরণ। লেখক নিখুঁতভাবে লিখেছেন-

> “রুবি স্বামীর কথা অনুসরণ করে চোখটাকে আকাশ বরাবর উত্তর-দক্ষিণ করে ঘাড় নাড়ল|.. যেখানে আকাশটা মাটি ছুঁচ্ছে ওখানেই জমিটা।...ওরা রাস্তা পার হবার আগে এই নতুন কলোনিটার দিকে তাকিয়ে এইসব বলে রাস্তা পার হল। কাঁচা ড্রেনের উপর সিমেন্টের সেতু। পার হয়ে কলোনির সদর।...বাস চলাচলের রাস্তার ধার থেকে বাড়িগুলো তৈরি হতে হতে পিছু হটেছে। প্রায় আধাআধি বাড়িতে ভরে গেছে। পিছন দিকে এখনো মাঠ।” [২]

তাদের প্লট দেখতে যাওয়ার পথে জলা জমি ভরাট করে তৈরি হওয়া কলোনির চিত্র বিক্ষিপ্তভাবে ধরা পড়ে-

> “দুধারে জমি। কোন কোনটাই সীমানা চিহ্ন দেওয়া। সিমেন্টের তৈরি চৌকো ঢিবি, তার উপর আঁচড় কেটে প্লট নম্বর লেখা। কিছুদূর গিয়ে রাস্তাটা অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। দরকার পড়েনি কারণ ওদিকে আর বাড়ি ওঠেনি, ইলেকট্রিক খুঁটিও নেই।” [৩]

নিখিলের সমগ্র কলোনিটিকে সমুদ্র মনে হয়েছে-

> “রাস্তা থেকে পাশের জমিতে নেমে হাঁটতে শুরু করল। বর্ষার কাদায় চটচটে। বুনো গাছ আর লম্বা ঘাসে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যাচ্ছে। থেমে পিছু ফিরে নিখিল বলল, ‘এই জায়গাটায় এলে মনে হয় যেন মাঝ সমুদ্রে এসেছি.. এখানে বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল। বর্ষার সময় সাপখোপ থাকতে পারে।” [৪]

এ আসলে এক ধ্বংসোন্মুখ প্রকৃতির শেষ অবশিষ্টাংশ, যা নগরের রাক্ষুসে গ্রাসে বিলীন হতে চলেছে। গল্পে অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে বলা হয়েছে-

> “প্রায় আধা-আধি বাড়িতে ভরে গেছে। পিছন দিকে এখনো মাঠ। মাটি পড়ছে জমি ভরাট হচ্ছে।
> দু-চার বর্ষা না গেলে আর বাড়ি উঠবে না।” [৫]

পরিবেশ-ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ তাঁর ‘Environmentalism: A Global History’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ‘উন্নয়ন’,‘আবাসন’ মূলত প্রকৃতির বুক চিরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষা করে। নিখিলের ‘তিন কাঠা জমি’র এই আকাঙ্ক্ষা আসলে প্রকৃতিকে ক্ষতবিক্ষত করার এক নীরব সামাজিক প্রক্রিয়া। যেখানে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি প্রকৃতির বিনাশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই ভরাট হয়ে যাওয়া জলাভূমি আসলে এক মরণাপন্ন বাস্তুতন্ত্রের প্রতীক, যা মধ্যবিত্তের অবচেতন মনে কোন অপরাধবোধ তৈরি করে না। সে তৈরি করে এক নতুন জীবনের উন্মাদনা। এখানে নগর পরিবেশবাদের সাথে নিম্ন-মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্রটি এক অবিচ্ছেদ্য সামাজিক সত্য হিসেবে উঠে আসে। ‘নগর-পরিবেশবাদে’র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক স্তম্ভ হল ‘পরিবেশগত বৈষম্য’(Environmental Injustice)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পুঁজিবাদী নগরায়ণ সবশ্রেণীর মানুষের জন্য সমান পরিবেশগত অধিকার এনে দেয় না। উচ্চবিত্ত সমাজ শহরের সবচেয়ে সুরক্ষিত, পরিবেশগতভাবে উন্নত এবং প্রাকৃতিক ভাবে বাসযোগ্য অংশে নিজেদের আস্তানা গড়ে তোলে। পক্ষান্তরে, নিখিলদের মতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক দৈন্যতা তাদের ঠেলে দেয় শহরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, অস্বাস্থ্যকর ও নিচু ভূখণ্ডে। পুঁজিবাদের জটিল নিয়মে আধুনিক শহরের স্থান এখন কোন প্রাকৃতিক অধিকার নয়। তা একটি অতি মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য পণ্য। নিখিলের মত একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে কলকাতার মূল ভূখণ্ডে পরিচ্ছন্ন প্রাকৃতিক বলয়ে বাসস্থান করা অলীক স্বপ্ন। তাকে এই অর্থনৈতিক দূরবস্থা বাধ্য করে ধুলোবালি, কাদাজল নির্মিত পরিবেশকে নিজেদের পরম আশ্রয় হিসেবে বেছে নিতে। তারা নিজেদের অজান্তেই প্রকৃতির এই বিনাশ বা জলাভূমি ভরাটের এক নীরব সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের শরিক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। কারণ, প্রকৃতির মৃত্যু না ঘটলে তারা সস্তায় জমি পাবে না। নগর-পরিবেশবাদ দেখায় কিভাবে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক হীনবল অবস্থা, তাদের পরিবেশগতভাবে এক মারাত্মক অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। সেখানে নিজের বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির বিলুপ্তিকে তারা একমাত্র পথ হিসেবে মেনে নেয়।

এই স্থানিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সমান্তরালে নগর-পরিবেশবাদের একটি প্রধান স্তম্ভ হল ‘স্থানিক উৎকণ্ঠা’(Spatial Anxiety)। আধুনিক শহরের নির্মম বাস্তবতায় নিজের একটু নিজস্ব ‘space’ বা ‘একফালি ছাদ’ পাওয়ার জন্য মানুষের যে আদিম ও মরিয়া লড়াই তা তার সামগ্রিক মনস্তত্ত্বের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলে। ‘চতুর্থ সীমানা’ গল্পে রুবি যখন তার তিন কাঠা জমির মালিকানা নিশ্চিত করে, তখন তার ভেতরের মানসিকতা বদলে যেতে থাকে। প্রথমে যে উন্মুক্ত প্রকৃতিকে সে সরল বিস্ময়ে উপভোগ করছিল, জমির চারিদিকের সীমানা খুঁটি খুঁজে না পেতে তার মধ্যে এক অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠা দেখা দেয়-

> “রুবি শুনতে পেল না। প্রায় মাটি শুঁকতে শুঁকতে সে এগোচ্ছে। হঠাৎ থমকালো। দুহাতে ঘাস
> সরিয়ে অসুখটা বলল, ‘এই তো।’... ‘এতক্ষণে স্বস্তি পাওয়া গেল।’ চারপাশের পৃথিবীতে চোখ
> ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে রোগী আঁচল রাখল কাঁধে, ‘যা ভয় ধরেছিল।” [৬]

জমির চারিদিকে সীমানা খুঁটি নিশ্চিত করার সাথে সাথেই তার অবচেতনে এক উগ্র দখলদারিত্বের মানসিকতা জেগে ওঠে। নিখিলের অবস্থাও একই রকম ছিল।৭রুবি জানতে পারে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, জজ সাব এডিটরদের মতো বিত্তবান প্রতিবেশীরা জমি কিনেছে। সাথে সাথেই তার মধ্যবিত্ত সুলভ অবস্থানকে একটি

.

সুনির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত করার সুপ্ত ইচ্ছা প্রকাশ পায়। যখন তারা স্বপ্নের বাড়ির নকশা তৈরি করে, তখন সে বাস্তবসম্মত আধুনিক জীবনযাত্রার নিরিখে ঘর বিন্যাসের কথা ভাবে। নিখিলকে জানায় ছোট বাড়িতে শাশুড়ির জন্য আলাদা ঘরের প্রয়োজন নেই, কারণ সমকালীন ছোট পরিবারের পরিসরে এবং সীমিত স্থানে সব কিছু সংকুলান করা কঠিন। তার এই দৃষ্টিভঙ্গি কোন নৈতিক স্খলন নয়, বরং এটি নগরের সীমিত স্থানাঙ্ক এবং মধ্যবিত্তের বাস্তববাদী জীবনের এক স্বাভাবিক প্রতিফলন। এই প্রসঙ্গে মারি বুকচিনের ‘Social Ecology’ বা ‘সামাজিক পরিবেশবিদ্যা’ তত্ত্বটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বুকচিন মনে করেন-

> “The dominance of human over human is fundamentally linked to the dominance of human over nature” [৭]

অর্থাৎ মানুষ যখন প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে তাকে নিজের মর্জিমতো কাটছাট করতে চায়, তখন সে নিজের সমাজের বা পরিবারের দুর্বল মানুষের ওপর একই রকম আধিপত্যবাদী আচরণ করতে শুরু করে। রুবির কাছে তার বৃদ্ধা শাশুড়ি হলেন ঠিক সেই ‘অপ্রয়োজনীয় নিচু জমি’ বা ‘জলাভূমি’র মতো, যাকে ভরাট করে বা সরিয়ে দিয়ে নিজের মন মতো মসৃণ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায়। নিখিলকে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় বোঝায় যে,

> “খরচ আমাদের কমই হবে তিনটে লোকের জন্য এত বড় তো আর আমাদের দরকার নেই।’
> ‘তিন কোথায় চারজন তো।’ ‘মা আর কদিন বাঁচবেন।” [৮]

তবে রুবির এই অবস্থানকে নৈতিক স্খলন হিসেবে না দেখে নগর পরিবেশবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নির্মিত পরিবেশের ক্ষুদ্র পরিধি মানুষের সামাজিক চিন্তার বাস্তবতাকে সংকুচিত করে তোলে। যেখানে মানবিক অনুভূতির চেয়ে সামাজিক বাস্তবতা এবং সীমিত স্থানের হিসাব অনেক বেশি অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। এখানে মতি নন্দী উত্তর কলকাতার পুরনো শহর এবং প্রান্তসীমার নতুন উপনগরীর মধ্যে এক গভীর ভৌগোলিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈপরীত্য তৈরি করেছেন। পুরনো কলকাতার ঘিঞ্জি বাড়িগুলোতে জায়গার অভাব থাকলেও সেখানে এক ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক সংহতি ছিল, মানুষের মানুষের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। যার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় নিখিলকে দেওয়া ছোট কাকার চিঠিতে।কিন্তু সেখানেও আমরা দেখি স্বার্থের চোরাগোপ্তা আঘাত। আবার প্রয়োজনে ছোট কাকাকে নিখিলের কাছেই সাহায্যের হাত পাততে হয়েছে পুরনো সম্পর্কের দোহাই দিয়ে। কিন্তু নতুন উপনগরীর ‘আপাতমুক্ত হাওয়া’ এবং ‘প্লট কালচার’ মানুষকে কঠোর হিসাবের বাস্তবতার সম্মুখীন করায়। নিজের জন্য চারিদিকের দেয়াল বা চতুর্থ সীমানা নিশ্চিত করতে গিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত আর একটি অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করে ফেলে। গল্পের একপর্যায়ে নিখিল যখন জমির সীমানা খুঁটিগুলো খুঁজে পেয়েছিল তখন রুবি আনন্দে উল্লাসিত হয়ে ওঠে। সে তার সেই অনুভবকে ব্যক্ত করে একতলার ভাড়াটে বউয়ের কাছে-

> “বিরাট কলোনি আর কি ফাঁকার উপর, হুহু করছে হাওয়া মনে হয় যেন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি ফিরতে ইচ্ছা করে না।”[৯]

কিন্তু ঘরে ফিরে মন্টুর আনা ছোটকাকার চিঠিতে এবং নিখিলের মায়ের কথায় তার সেই আনন্দ সংকুচিত হয়ে যায়। কাকিমার অসুস্থতার সংবাদে রুবির আচরণে স্বপ্নভঙ্গের ছায়া পড়ে। মতি নন্দী দেখিয়েছেন, নগর মানুষের ভৌগলিক সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে তার মানবিক সীমানার এক অদ্ভুত সংকোচন। এই সংকোচন কেবল রুবির একার নয়। আসলে এটি সমগ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্তিত্বের সংকট। মতি নন্দীর নগর-পরিবেশচেতনা কেবল একটি গল্পে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যের শিরায়-উপশিরায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর ‘জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ’ ছোটগল্পে তীব্র গ্রীষ্মে কলকাতার বস্তি ও নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ার কলতলা-চিত্র ফুটে উঠেছে, যা সম্পদ বন্টনগত বৈষম্য ‘Environmental Injustice’-র এক অসামান্য উদাহরণ। জলের মতো মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদের কৃত্রিম সংকট কিভাবে মানুষের ভেতরের হিংস্রতাকে উসকে দেয় এবং পাড়ার সামাজিক পরিবেশকে

বিষাক্ত করে তোলে, তা তিনি দেখিয়েছেন। জলের লাইনকে কেন্দ্র করে মানুষের মারামারি আসলে পরিবেশগত বিষমতার প্রতীক। যেখানে ক্ষমতার জোরে প্রাকৃতিক সম্পদকে কুক্ষিগত করার এক শহুরে প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার ‘কোনি’ উপন্যাসের শুরুতেই গঙ্গার ঘাটের যে বর্ণনা আছে, তা সরাসরি জলদূষণের বাস্তব চিত্র। একদিকে অধ্যাত্ম চেতনা ও পূণ্যস্নান, অন্যদিকে শহরের কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ও নর্দমার নোংরা জল সেই গঙ্গাকেই দূষিত করছে। মতি নন্দী এই বৈপরীত্য কে অত্যন্ত নির্মমভাবে তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন কিভাবে নাগরিক সভ্যতা তার নিজের উৎসকেই প্রতিদিন বিষাক্ত করে চলেছে। একইভাবে ‘স্টপার’ এবং ‘স্ট্রাইকার’ উপন্যাসে কলকাতার খেলার মাঠ বা পার্কগুলো হল দমবন্ধ করা ঘিঞ্জি শহর থেকে চরিত্রগুলির একটুখানি খোলা হাওয়া এবং মুক্তি পাওয়ার একমাত্র ‘কৃত্রিম ফুসফুস’। নগর-পরিবেশবিদ্যার দৃষ্টিতে এই মাঠগুলো কোন বিনোদন কেন্দ্র নয়, বরং শহরের ইট কাঠের আগ্রাসনের মধ্যেও কিভাবে প্রান্তিক যুবসমাজ এই মাঠকে আঁকড়ে ধরে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায় তা মতি নন্দী বারবার দেখিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক নগরায়ন যে খেলার মাঠগুলোকে গ্রাস করছে সেই ইঙ্গিতও তাঁর লেখায় স্পষ্ট। তিনি প্রকৃতিকে কোন মেকি রোমান্টিক রূপ দেননি। তাঁর কাছে প্রকৃতি মানেই- তা কলকাতার বাস্তবতা, ধুলোবালি, ধোঁয়া আর নর্দমার গন্ধ। তিনি প্রমাণ করেছেন যে শহরও প্রকৃতিরই অংশ এবং এই কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা মানুষের মানবিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে।

গল্পের এই গভীর পরিবেশগত সামাজিক সংকট একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে, যখন আমরা ‘চতুর্থ সীমানা’-র চরম পরিণতির দিকে তাকাই। এখানে গল্পের মোড় ঘুরে যায় এক নির্মম পারিবারিক ট্রাজেডির দিকে। যা মধ্যবিত্তের এই স্থানিক আগ্রাসন ও আভিজাত্যের স্বপ্নকে সম্পূর্ণ তছনছ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত নিখিল সেই ‘তিনকাঠা জমি’তে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত বাড়িটি তৈরি করতে পারে না। তার ছোট কাকার একটি চিঠি এবং ছোট কাকির মারাত্মক অসুস্থতায় চিকিৎসার খরচের দায় নিখিলের মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ও স্বপ্নকে এক লহমায় ওলট-পালট করে দেয়। নিখিল-রুবির বাড়ি তৈরীর সমস্ত আধুনিক পরিকল্পনা, চারিদিকের পাঁচিল উঁচু করার বাস্তবসম্মত জেদ বনাম ছোটকাকির জীবন বাঁচানোর নির্মম সামাজিক কর্তব্য গল্পটিকে এক অভূতপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক রূপ দেয়। কাকার চিঠি পাওয়ার পর নিখিল যখন পালাতে চায়, তখনই পেশায় ড্রাফটসম্যান অমিয় তাকে জানায় প্ল্যান অনুযায়ী তার বাড়ি করতে খরচ হবে চল্লিশ হাজার টাকা। নিখিল চেষ্টা করে নিজের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু অবচেতনে জমির চতুর্থ পিলারে সে পরাবাস্তব এক রূপক দেখতে পায়। সেখানে অসুস্থ ছোটকাকি পিলার হয়ে হাসছে। নিখিল দেখে বাড়ি করার কথা ভাবলেই মাটির ভেতরে বসে যেতে থাকে সেই চতুর্থ পিলারটি এবং সে আর্তনাদ করে ওঠে - ছোটকাকি চলে গেলে তার জমিও হারিয়ে যাবে। তার বাড়ি করার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। সে ভাবতে বাধ্য হয় -

> “বোধহয় নতুন প্ল্যানই করতে হবে। বাড়ি করা খুব শক্ত কাজ।” [১০]

এই যে নিখিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও স্বপ্ন দেখে পিছিয়ে আসা, তাহল বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্তের চিরাচরিত ‘রিস্ক না নেওয়ার প্রবণতা’।এটি এক ধরনের অর্থনৈতিক ভীরুতা ও সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করে।পুঁজিবাদের উপর দাঁড়িয়ে তৈরি হওয়া শহুরে আবাসন মধ্যবিত্তকে এক অলীক নিরাপত্তার বিভ্রম দেয়। নিখিল বহুকষ্টে যে ‘তিনকাঠা জমি’র চারদিকে পাঁচিল তুলতে চেয়েছিল তা ছিল এক ধরনের ‘স্থানিক প্রতিরক্ষা’। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্তের এই অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থান এতটাই ভঙ্গুর যে, একটিমাত্র অসুস্থতার চিঠি তার পুরো কংক্রিটের সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সে কোন বড় অর্থনৈতিক ঝুঁকি বা রিস্ক নিতে পারে না, কারণ তার পিছনে কোন বড় পুঁজির ব্যাকআপ নেই। যদি সে নিজের জমি বা অর্থ বাজি রেখে ঝুঁকি নিত, তাহলে হয়তো তার বাড়ি তৈরি

হতো, কিন্তু তার পারিবারিক ও মানবিক ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যেত। নিখিলের এই পিছিয়ে আসা আসলে প্রমাণ করে যে নিম্ন-মধ্যবিত্তের তৈরি করা এই কৃত্রিম পরিবেশের কোন স্থায়ী ভিত্তি নেই। তাদের বেঁচে থাকার লড়াই সবসময়ই একধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়তিবাদের শিকার। পুঁজিবাদী নগরায়ণ শেষপর্যন্ত নিখিলের মতো নিম্ন-মধ্যবিত্তদের কেবল এক টুকরো জমির প্রলোভন দেখায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এক অনন্ত অনিশ্চয়তার বৃত্তে বন্দী রাখে। এইপ্রেক্ষিতে নগর-পরিবেশবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক দিক হলো নগর ও প্রান্তিকতার দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান। শহর যখন চারদিকে বিস্তৃত হয়, তখন সে কেবল প্রকৃতিকেই গ্রাস করে না, সমাজকেও খন্ডখন্ড করে করে ফেলে। নিখিল-রুবির চেনা জমির চারিদিকের পরিবেশ আসলে একটি ক্রান্তিকালীন ল্যান্ডস্কেপ। সেখানে গ্রামীণ নিস্তব্ধতা এবং শহুরে কোলাহল পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন স্থানগুলোতে মানুষের মনস্তত্ত্ব তীব্র দোলাচলের মধ্যে থাকে। তাদের জমি ঘিরে পাঁচিল তোলার চিন্তা আসলে তাদের অবচেতনে এক সামাজিক সুরক্ষা তৈরীর আকুলতা। এটি যেকোনো মধ্যবিত্ত নাগরিকের স্বভাবজাত প্রবণতা। তারা নিজেদের জন্য একটি ক্ষুদ্র বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে চাইছিল। মূলত বহির্জগতের আগ্রাসন থেকে নিজেদের বাঁচানোর এক প্রতিরক্ষামূলক দেওয়াল। কিন্তু লেখক এই দেওয়ালের অসারতাকে গল্পের ট্র্যাজিক সমাপ্তি দিয়ে আঘাত করেছেন। নিখিলের অবচেতনে যে পিলার বা খুঁটি বসে যাওয়ার অনুভূতি তৈরি হয়, তা আসলে তার তীব্র মনস্তাত্ত্বিক রূপক। এই রূপকটি প্রমাণ করে যে, প্রকৃতির বুকে জোর করে বসানো কংক্রিটের স্তম্ভগুলো মানুষের জীবনের মৌলিক দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে টিকে থাকতে পারে না। ছোটকাকির অসুস্থতা এবং তার জন্য সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিখিলকে তার সংকীর্ণ স্থানে স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত করে এক উদার মানবিক প্রান্তরে এনে দাঁড় করায়।

মতি নন্দী ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ ও দূরদর্শী শিল্পী। তাঁর তীক্ষ্ণ সামাজিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রমাণ করে যে, নগরায়ণ ও মধ্যবিত্তের আবাসন আকাঙ্ক্ষা কিভাবে প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তার চড়ামূল্য দিতে হয় মানুষের নৈতিকতা, পারিবারিক সৌহার্দ্য এবং মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে। 'চতুর্থ সীমানা' শুধুমাত্র এক টুকরো জমি কেনা বা বাড়ি বানানোর গল্প নয়। এটি আধুনিক সভ্যতার আত্মহননকারী নাগরিক আগ্রাসন ও তার ফলে সৃষ্ট মানবিক সংগ্রামের দলিল। বিংশ শতাব্দীর পরিবেশ সংকটের আবহে দাঁড়িয়ে তাঁর এই নগর-পরিবেশবাদী চেতনার পাঠ কোন সাহিত্যিক বিলাসিতা নয়, এ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি এবং প্রাসঙ্গিক। এই পাঠ, আমাদের নির্মিত কৃত্রিম পরিবেশের সীমাবদ্ধতা সরিয়ে এক বৃহত্তর ও বাস্তুতন্ত্রিকর চেতনার দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। আজকের দিনে আমরা যখন নাগরিক পরিবেশের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হই, তখন মতি নন্দীর কয়েক দশক আগের এই ছোটগল্পটি এক দূরদর্শিতার স্মারক হয়ে ওঠে। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, সভ্যতার প্রকৃত অগ্রগতি চারিদিকের পাঁচিল উঁচু করায় নয়, বরং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানবিক উদারতার মধ্যে নিহিত। এই মহাসত্যকে মতি নন্দী তাঁর 'চতুর্থ সীমানা' গল্পের ট্র্যাজিক ক্লাইম্যাক্সের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন।

References:

1. Dhruba Jyoti Ghosh, Ecology and Traditional Wetland Practice: Lessons from Westwater Utilisation in East Calcutta Westlands, ISEE, 2005, Page 45.
2. মতি নন্দী, ছোট গল্প সমগ্র, সম্পাদনা-মানস চক্রবর্তী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ: ১ লা বৈশাখ ১৪১৯, পুনর্মুদ্রণ: ১লা ফাল্গুন ১৪২৭, পৃষ্ঠা ৩০৮।
3. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১০।
4. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১০।
5. তদেব, পৃষ্ঠা ৩০৮।
6. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১১।
7. Murry Bookchin, what is Social Ecology?, Black Rose Books, 1993, Page-23.
8. মতি নন্দী, ছোট গল্প সমগ্র, সম্পাদনা-মানস চক্রবর্তী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ: ১ লা বৈশাখ ১৪১৯, পুনর্মুদ্রণ: ১লা ফাল্গুন ১৪২৭, পৃষ্ঠা-৩০৯।
9. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৩।
10. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৬।

Bibliography:

1. নন্দী, মতি। ছোটগল্প সমগ্র। সম্পাদনা. মানস চক্রবর্তী। দীপ প্রকাশন। ১৪২৭।
2. Bookchin,Murry. What is Social Ecology?. Black Rose Books. 1993.
3. Ghosh, Dhruba Jyoti. Ecology and Traditional Wetland Practice: Lessons from Westwater Utilisation in East Calcutta Westlands. ISEE. 2005
4. Guha, Ramchandra. Environmentalism: A Global History. Oxford University Press. 2000.
5. Mumford, Lewis. The Urban Prospect. Secker & Warburg.1968.

cc BY NC